গোপাল হালদারঃ বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশ

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন গোপাল হালদার। জন্মগ্রহণ করেছিলেন সম্ভ্রান্ত এবং আর্থিক দিক থেকে বেশ সচ্ছল পরিবারে। প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেছেন, ওকালতি করেছেন, ফেনি কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। কিন্তু প্রথাগত গবেষণা ও পেশা থেকে তিনি সরে এলেন। আমাদের সময়ে এমন মানুষ যথার্থই বিরল। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত জীবনযাপন করে তাঁর মধ্যে দিয়েই সৃজনশীলন কাজ কিংবা গবেষণা করে থাকি। কিন্তু নিজের জীবনকে নিশ্চিত জায়গা থেকে অনিশ্চিত জায়গায় নিয়ে গিয়ে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, এবং সেই কাজ তাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে তাও অজানা – এমন জীবনযাপন একালে প্রায় দেখাই যায় না।

তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে পৌঁছোবার ক্ষমতা রাখতেন, পৌঁছেছিলেনও । আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে মূল্যবান দান তিনি রেখে গেছেন, যদিও তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি এখন প্রায় দুর্লভ, তা অবিস্মরণীয়। প্রবন্ধসাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব – এসব ক্ষেত্রেও যে মূল্যবান দান তিনি রেখে গেছেন, সেগুলি যদি একত্র করা হয়, তবে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বকে বোঝার চেষ্টা করা যায়, যদিও কাজটি বেশ কঠিন।

আমরা দেখব তিনি যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে আসবার কথা ভাবছেন, এবং কোন ফ্রন্টে কাজ করবেন পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি, সেই সময় দীর্ঘ ছয় বছর, ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সাল তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। আবার কমিউনিস্ট পার্টি যখন নিষিদ্ধ হল, স্বাধীনতার পর ১৯৪৮-৪৯ সালেও তিনি জেল খেটেছেন। আবার ১৯৬৯ সালে প্রফুল্ল ঘোষের সরকার যখন অল্পদিন ছিল, তখন আইন অমান্য করে তিনি জেলে গেছেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে অল্প-বিস্তর যুক্ত হয়েছেন, যদিও মূলত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন, এমনকি কৃষক সাধারণ-সম্পাদক পর্যন্তও হয়েছেন।

রাজনীতির পাশাপাশি তিনি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। আমরা জানি সুনীতিকুমারের কমিউনিস্ট ছাত্র যাঁরা ছিলেন- অনিল কাঞ্জিলাল, মহাদেবপ্রসাদ সাহা- তাঁদের মধ্যে গোপাল হালদার অন্যতম। সুনীতিকুমার নিজে কমিউনিস্ট ছিলেন না, কমিউনিজম-এর সঙ্গে তাঁর দূরত্বই ছিল। কিন্তু ছাত্র হিসাবে, মেধার নিরিখে তিনি গোপাল হালদারকে কোলে স্থান দিয়েছিলেন। এবং ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে গোপাল হালদারের স্থান কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের থেকে খুব নীচে নয়। এমন তুলনায় অনেকেই আশ্চর্য হতে পারেন। ভাবতে পারেন এ অতিশয়োক্তি, ভাবতে পারেন গোপাল হালদার আমাদের সগোত্র, বামপন্থী ছিলেন বলেই এমন অতিশয়োক্তি করে বসলাম। আমরা বলব ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার ছিলেন পথিকৃৎ , কিন্তু তাঁর এই পথিকৃৎসুলভ কর্মধারাতেও তিনি সবসময় অ্যাকাডেমিক সীমানা অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু গোপাল হালদার তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক চর্চাতে এই অ্যাকাডেমিক সীমানা অতিক্রম করে গেছেন। আমরা যাঁদের বলি Social linguist, সমাজ-সংশ্লিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক, তেমন অবস্থান বাংলা ভাষাতত্ত্ব

Society Language and Culture

চর্চার ক্ষেত্রে গোপাল হালদারই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। আশ্চর্য হতে হয় নোয়াখালির লোকভাষা নিয়ে তিনি চর্চা করেছেন, পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলি নিয়ে তিনি ক্ষেত্র সমীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। এ ধরনের কাজ পরে ঢাকাতে হয়েছে, আবদুল হাই, এনামুল হকও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কিন্তু এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে গোপাল হালদারের স্থান বোধ হয় প্রথম সারিতে। এ বিষয়ে আর-একটু অনুসন্ধান যদি আমরা করি, গবেষণা করি, ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে গোপাল হালদারের যথার্থ স্থান নিরূপণ করতে সক্ষম হব। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার স্তরে এই অনুসন্ধান, এই ধরনের গবেষণা আদৌ হয়নি।

তাঁর *'ভারতের ভাষা'* বলে বইটি যাঁরা পাঠ করেছেন জানেন কী সহজ ও সুন্দর করে ভারতের সবকটি ভাষার সূত্র, গোত্র, উৎস ও বিবর্তন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমাদের যৌবনে অবশ্যপাঠ্য ছিল নীহাররঞ্জন রায়-এর *'বাঙালির ইতিহাস'*। সেই মহৎ গ্রন্থটিকে সর্বজনবোধ্য করে সংক্ষিপ্ত আকার দিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ঠিক তেমন করেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন ভাষার ক্ষেত্রে যে কাজ করে গেছেন তা একটি জায়গায় সকলের বোধগম্য করে উপস্থিত করার কৃতিত্ব যদি কেউ অর্জন করে থাকেন, তিনি গোপাল হালদার। তাঁর *'ভারতের ভাষা'* একটি অসাধারণ গ্রন্থ। এটি পাঠ করলে ভারতের ভাষা সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব। গবেষকদের যেমন কাজে লাগবে, সাধারণ পাঠকরাও তেমনি উপকৃত হবেন।

এই দিকটায় আমি বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। যেহেতু তিনি রাজনীতির মানুষ ছিলেন, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে, কৃষক-আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিরলস ছিলেন সারাজীবন, অ্যাকাডেমিক স্তরে তাঁর যে মূল্যায়ন হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, সেই মূল্যায়নের স্তরে আমরা পৌঁছতে পারিনি। তাঁর উপন্যাস নিয়ে ইতিমধ্যে গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাঁর এই ভাষাতাত্ত্বিক পথনির্দেশ অনুসরণ করে তেমন চর্চা আজও হয়নি।

তেমনই সাংবাদিকতার দিকে তাকালেও আমরা দেখব অধ্যাপনার জীবন থেকে সরে এসে তিনি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সুভাষচন্দ্রের *'ফরওয়ার্ড'* কাগজের সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, *'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'* কাগজের সহযোগী সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। অনুশীলন ও ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। *'পরিচয়'* সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছেন বেশ কয়েক বছর। আমাদের যৌবনে *'পরিচয়'* ছিল মডেল। সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সাহিত্য সমালোচনা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, জীবন নিয়েই বা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে- এসব বিষয়ে *'পরিচয়'* ছিল আমাদের কাছে দিগদর্শন। এই দিগদর্শন যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোপাল হালদার। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরে যাঁরা *'পরিচয়'* সম্পাদনা করেছেন তাঁদের মধ্যে যোগ্যতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন গোপাল হালদার।

আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের নিরিখ কী হবে তা নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন গোপাল হালদার। সেই সময় মার্কসবাদী সাহিত্যের সমালোচনায় যাঁরা পথ দেখাচ্ছিলেন – নীরেন রায়, হিরণ সান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন গোপাল হালদার। মার্কসবাদী

Society Language and Culture

সমালোচনা কোন পথে এগোবে, সে কি শুধুই রাজনীতিকেন্দ্রিক হবে, ভাবাত্মক হবে – এইসব বিষয়গুলি নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভেবেছেন। নিজের রচনার মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছিল। আজ এ কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে, সঠিকভাবে চিনতে যাঁরা শিখিয়েছেন, গোপাল হালদার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেইসময় রবীন্দ্র গুপ্তর রবীন্দ্র সমালোচনা নিয়ে তুমুল আলোড়ন চলছিল। রবীন্দ্রনাথের আগে 'বুর্জোয়া' শব্দটি বসানোয় তুমুল হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্টদের তো সব তাতেই দোষ। তারা যা বলে কোনোদিনই সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে তাদের দিকে আঙুল তোলা হয়। 'বুর্জোয়া' শব্দটি তো গালাগাল নয়। নিন্দাবাচক শব্দও নয়, এটি একটি শ্রেণিনির্দেশক ফরাসি শব্দ। কিন্তু আমাদের দেশে 'বুর্জোয়া' বললেই মনে করা হয় যেন কাউকে কটাক্ষ করা হল, নিন্দা করা হল। রবীন্দ্র গুপ্ত একটু উগ্রভাবে সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি যে খুব অন্যায় করেছিলেন তা নয়, কারণ 'বুর্জোয়া' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গুপ্তর অনেক আগে বুদ্ধদেব বসুই ব্যবহার করেছেন এবং সঠিক পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্র গুপ্ত যে সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন তাকে ভারসাম্যে পৌঁছিয়ে দেওয়া, সঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার কাজটি করেছেন গোপাল হালদার।

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে গোপাল হালদারের সম্পাদনায় যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল আমার মতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেটি শ্রেষ্ঠতম সংকলন। কয়েকটি অসাধারণ রচনা সেখানে সংকলিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটিই হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *'কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ'*, রবীন্দ্রনাথ ও নবজাগরণ বিষয় নিয়ে সুশোভন সরকার, হিরণ সান্যাল, চিন্মোহন সেহানবিশের লেখা, ছোটগল্প নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা এবং গোপাল হালদারের নিজের লেখা। স্বদেশি আন্দোলনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাকে যে অমন করে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, তা আগে কেউ ভাবেননি। তিনি যেভাবে বিষয় নির্বাচন করেছেন , যেমন করে প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করেছেন, যাঁদের দিয়ে লিখিয়েছেন- সব মিলিয়ে সংকলনটি আদর্শ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার জন্য, অনুভব করার জন্য সংকলনটি দিকনির্দেশ হয়ে থাকবে। সুতরাং ঐতিহ্যকে বিচার করার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিও গোপাল হালদার উত্তরকালের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন।

একসময় পার্টির অভ্যন্তরে এটা রীতি ছিল যাঁরা সৃজনশীল কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাঁদেরকেও শ্রেণিরাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বজবজ ট্রেড ইউনিয়ন করতে পাঠানো হয়েছিল, সমরেশ বসুকেও ট্রেড ইউনিয়ন করতে পাঠানো হয়েছিল, এই রীতি অনুযায়ী গোপাল হালদার যুক্ত হয়েছিলেন কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে। চার বছর তিনি কৃষক সভার সম্পাদক ছিলেন। সেই সময়কালের কৃষকসভার রিপোর্টগুলি যদি আমরা পাঠ করি, দেখব- শ্রেণি আন্দোলনের প্রতিবেদন কোন স্তরে পৌঁছোতে পারে! সেগুলি যে শুধু সাহিত্যগুণান্বিত ছিল তাই নয়, শিক্ষণীয় ছিল। সেকালে যাঁরা এ কাজ করতেন তাঁরা এমনই যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। সেদিক থেকেও গোপাল হালদার দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছেন।

Society Language and Culture

বাংলার রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের *'গোরা'* একটি দিগদর্শন। সমকালীন ভারতবর্ষে যতগুলি উপাদান ছিল, যতগুলি দ্বন্দ্ব ছিল সবগুলিই প্রতিফলিত হয়েছে *'গোরা'*র মধ্যে। কিন্তু এই *'গোরা'* এমনভাবে স্বীকৃতি পেল কবে? সে তো রবীন্দ্রনাথের সমকালে হয়নি। *'গোরা'*-কে এমনভাবে অনুভব করা হয়েছে, পাঠ করা হয়েছে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে কমিউনিস্টদের সমালোচনার মধ্য দিয়ে। অথবা *'অচলায়তন'*- ধর্মের অচলায়তন, সংস্কারের অচলায়তনকে ভাঙার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনির অবতারণা করলেন সেখানে তো আমরা মুসলমান ও দলিত শ্রেণির আভাস পাই। তাদের দিয়েই ভারতবর্ষের অচলায়তনকে ভাঙার জন্য রবীন্দ্রনাথের ডাক। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠরা *'অচলায়তন'* প্রসঙ্গে এই অনুভব মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথকেও একটু পিছিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলতে হল, "আমার ভাঙাটা শুধু ভাঙার জন্যে নয়, গড়ার জন্যে ভাঙা।" অর্থাৎ এই ভাঙন না আনতে পারলে হিন্দুধর্মের মুক্তি নেই, ভারতবর্ষের মুক্তি নেই। আমি এই কথাই বলতে চাইছি, যে লেখক রাজনীতির মধ্যে নেই, তিনিও সত্যদৃষ্টি দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে সমাজকে বুঝতে গিয়ে এমন কাজ করে ফেলেছেন, *'গোরা'* লিখেছেন, *'অচলায়তন'*, *'রক্তকরবী'* লিখেছেন। আর যিনি রাজনীতির মধ্যে আছেন, মার্কসবাদকে আত্মীকরণ করেছেন, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পাঠ নিয়ে তিনি যখন লিখতে বসবেন তখন সমকাল তাঁর লেখায় নিবিড়ভাবে উপস্থাপিত হবেই।

তারাশঙ্করের মধ্যেও আমরা দেখব সমকালের অস্থিরতা, দোলাচল চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে *'ধাত্রীদেবতা'*, *'গণদেবতা'*, *'পঞ্চগ্রাম'*-এ। ৪২-এর আন্দোলনের সময়ের যে অস্থিরতা, তার প্রতিফলন ঘটেছে গোপাল হালদারের গল্প-উপন্যাসে। সে এক কঠিন সময়- একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে স্তালিনের জনযুদ্ধের আহ্বান, ৪২-এর আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, আবার সেই আন্দোলন থেকে সরে এলেন গান্ধিজি- সব মিলিয়ে কোনটা পথ, কোনটাই সঠিক অবস্থান তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। সেই সময় গোপাল হালদার হয়তো পথের নিশানা দিতে পারেননি, সেটা ততখানি তাঁর কাজও নয়, কিন্তু তিনি যে পর্যালোচনা রেখে গেছেন, যে বিবেচনা রেখে গেছেন, তাঁর বর্ণনা, তাঁর বিশ্লেষণ, তাঁর চরিত্র-অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তা অনবদ্য দর্পণ হয়ে আছে।

তাঁর সাহিত্যকৃতিকে যদি আজকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি, দেখব তাঁর দান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে কোনো অংশে কম নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকৃতি অনেক উচ্চমানের, তার সঙ্গে আবার গোপাল হালদারের কোনো তুলনা চলে না। কিন্তু সমকালকে যদি সাহিত্যের মধ্যে খুঁজতে হয়, সঠিকভাবে অনুসন্ধান করতে হয় তবে গোপাল হালদারের গল্প-উপন্যাস পাঠ করতেই হবে।

তাঁর কৃতিত্বের অন্য একটি দিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইতিহাস প্রণয়ন। তাঁর আগে আমরা বাঙালির ইতিহাস পেয়েছি। ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রবোধ বাগচিরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। বাঙালি মনন কীভাবে তৈরি হচ্ছে, ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে কোথায় বাঙালির প্রভাব ও আধিপত্য প্রসারিত ও গভীর হচ্ছে, তার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতির রূপান্তর, বিবর্তনকে তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, পর্যালোচনা করে গেছেন, শুধু তা নিয়েই নিবিড় গবেষণা হতে

Society Language and Culture

পারে। শুধু সংস্কৃতি নিয়েই তাঁর যে গ্রন্থগুলি রয়েছে- *'সংস্কৃতির রূপান্তর'*, *'বাঙালি সংস্কৃতর রূপ'*, *'বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'* এবং এগুলি নিয়ে একত্রে *'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ'*- সেগুলি নিয়েই গভীর চর্চার একটি ধারা গড়ে ওঠা উচিত। সব মিলিয়ে দেখলে গোপাল হালদারের সাধনা, অবদান, সৃষ্টির বিভিন্ন ধারায় পথিকৃতের ভূমিকা আজও গভীর অভিনিবেশের দাবি করে, আর সে পথে খানিকটা অগ্রসর হলে আমরা লাভবান হব।

Society Language and Culture